বিষফুল

'ওদিকে যাবেন না বাবু !'

জগন্ময়বাবু চমকে উঠলেন। কাছাকাছির মধ্যে যে আর কোনও লোক আছে সেটা উনি টের পাননি। তাঁর ফলেই এই চমকানি। এবার দেখলেন তাঁর ডাইনে হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটি তেরো-চোদ্দো বছরের ছেলে, তার পরনে একটা ডোরা কাটা নীল হাফপ্যান্ট, আর গায়ে জড়ানো একটা সবুজ রঙের দোলাই। ছেলেটির রং কালো, মাথার চুল গ্রাম্য কায়দায় পরিপাটি করে আঁচড়ানো, চোখ দুটিতে শান্ত অথচ বুদ্ধিদীপ্ত চাহনি। গ্রাম্য হলেও নির্ঘাত ইস্কুলে পড়ে। অকাট মূর্খ হলে অমন চাহনি হয় না।

'কোনদিকে যাব না ?' জগন্ময়বাবু প্রশ্ন করলেন।

'ওই দিকে।'

অর্থাৎ জগন্ময়বাবু তাঁর হাঁটার পথে একবারটি থেমে যেদিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন, সেইদিকে।

'কেন, যাব না কেন ? কী হবে গেলে ?'

'বিষ আছে।'

'বিষ ? কীসে ?'

'ওই গাছে।'

সত্যি বলতে কী গাছটা দেখেই জগন্ময়বাবু থেমেছিলেন। ফুলগাছ। বুনো ফুল সম্ভবত। রাস্তা থেকে হাত বিশেক দূরে একটা টিপি, তার উপরে ওই একটি মাত্র গাছ। কাছাকাছির মধ্যেও যাকে গাছ বলে তা আর নেই। এ গাছটা কোমর অবধি উঁচু। তেকোনা ছোট ছোট পাতা, আর পাতার ফাঁকে ফাঁকে ভারী সুন্দর হল্‌দে কমলা আর বেগুনি রঙের ফুল। জগন্ময়বাবুর অবাক লাগছিল এই কারণেই যে গত তিন দিন ঠিক এই রাস্তা দিয়েই হাঁটা সত্ত্বেও ওই টিবি আর ওই গাছ ওঁর চোখে পড়েনি। অবিশ্যি হাঁটার সময় অর্ধেক দৃষ্টি পথে রেখেই চলতে হয়, বিশেষ করে সে-পথ যদি কাঁচা আর অজানা হয়। কাজেই না-দেখাটা আশ্চর্য নয়।

ছেলেটি এখনও সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে দেখছে।

'কী নাম তোর ?' জগন্ময়বাবু জিগ্যেস করলেন।

'ভগওয়ান।'

'ওরেব্বাবা !—বাংলা শিখলি কোথায় ?'

'ইস্কুলে।'

'আমার পিছন পিছন আসছিলি কেন ?'

'আমার বাড়ি ওই তো।'

জগন্ময়বাবু দেখলেন যেদিকে টিবি সেইদিকেই আরো সিকি মাইলটাক দূরে বাঁশবনের লাগোয়া খাপ্‌রার ছাউনি দেওয়া কুটির।

জগন্ময়বাবু আবার চাইলেন ছেলেটির দিকে। আরো দু-একটা প্রশ্ন করতে হয়। সে ফস্ করে যেচে তাঁকে এভাবে নিষেধ করবে কেন ?

'গাছের কী নাম ?'

'জানি না।'

'বিষ আছে জানলি কী করে ?'

'মরে যায় যে।'

'কী মরে যায় ?'

'সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর...পাখি...'

'কী করে মরে যায় ? গাছে বসলে ? না ফুল খেলে ?'

'কাছে গেলে।'

'কাছে মানে ? কত কাছে ?'

'চার হাত। পাঁচ হাত।'

'তুই তো খুব গোপ্‌পে দেখছি ! নাকি গাঁজা ধরেছিস এই বয়সেই ? তোর মাস্টারকে জিগ্যেস করিস ইস্কুলে। ফুলগাছে এরকম বিষ হয় না কখনও।'

ছেলেটি চুপ করে চেয়ে আছে।

'আমি এখানে নতুন লোক। চেঞ্জের জন্য এসেছি। আমার শরীর খারাপ, বুঝেচিস ? ওরকম গুল-টুল মারিসনি। এদেশে ওরকম ফুলের কথা কেউ শোনেনি। ওরকম হয়

না।'

'এদেশের না। সাহেব এনেছিল।'

ছেলেটা দেখছি নাছোড়বান্দা। বিশ্বাস করাবার জন্য বদ্ধপরিকর।

'কোন্ সাহেব ?'

'আপনি যে বাড়িতে আছেন, সেই বাড়িতে ছিল।'

'কবে এসেছিল ?'

'যেবার খরা হল তার আগের বার।'

'কী নাম ?'

'নাম জানি না। লাল মুখ, কটা চুল।'

'সে এসে এই ঢিপির উপর পুঁতে দিয়ে গেছে গাছ ?'

'জানি না।'

'তবে ?'

'সাহেব যাবার পরেই গাছ হল, হোই যে বন, ওইখানে ঘুরত হাতে কাচ নিয়ে।'

বটানিস্ট-টটানিস্ট হবে, জগন্ময়বাবু ভাবলেন। ভারী তাজ্জব কথাবার্তা বলছে ছেলেটি।

'ওই দেখুন না।'—ছেলেটি আবার আঙ্গুল দেখাল। 'ওই ঢিবিটার পাশে। ওই যে পাথরটা, তার ঠিক ডান পাশে।'

জগন্ময়বাবু দেখলেন। একটা সাদা সাদা কী যেন দেখা যাচ্ছে।

'কী ওটা ?'

'সাপ।'

'সাপ ?'

'সাপ ছিল। এখন হাড়। মরে গেছে। চিতি সাপ। বিষের দম ছাড়ে ওই ফুল।'

জগন্ময়বাবু বাইনোকুলারটা চোখে লাগালেন। হ্যাঁ, সাপই বটে। সাপের কঙ্কাল। ফুলটাও দেখলেন দূরবীনের ভিতর দিয়ে। যত সরল মনে হয়েছিল তত নয়। কোনও রংটাই সরল নয়। হলদের মধ্যে বেগুনির ছিটে, বেগুনির মধ্যে হলুদ, অরেঞ্জের মধ্যে সাদা আর কালো।

যন্ত্রটা চোখে লাগিয়ে আরো একটা মরা জিনিস দেখতে পেলেন জগন্ময়বাবু। এটাও সরীসৃপ, তবে এটার পা আছে চারটে। গিরগিটি বা বহুরূপী জাতীয় কিছু। এটা গত দু'একদিনের মধ্যে মরেছে।

'তা এরা সব অ্যাদ্দিনে সেয়ানা হয়ে যায়নি ? এখনও আসে আর মরে ?'

'রোজ মরে, একটা দুটো।'

'কই অত তো দেখছি না। মাত্র দুটো তো।'

'ঢিবির পিছনে আছে। বেশি মরলে পরে বাঁশ দিয়ে টেনে এনে সাফ করে দেয়।'

'কে ?'

'আমার বাবা। আমিও।'

'তা বাঁশ দিয়ে গাছে ঘা মেরে ওটাকেও সাবাড় করে দিস না কেন ? তা হলেই তো আপদ চুকে যায়।'

'আবার গজায়।'

'বলিস কী !'

'পুড়িয়ে দিলেও আবার গজায়।'

জগন্ময়বাবু ব্যাপারটাকে বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছিলেন না। কারণ পাঁচ আনার বেশি বিশ্বাস হয়নি এখনও তাঁর মনে যেটুকু হয়েছে তার কারণ একবার কোন্ বইয়ে যেন মাংসাশী গাছের কথা পড়েছিলেন। বিশ্ব-চরাচরে অনেক আশ্চর্য জিনিস আছে যার অনেকই এখনও হয়তো মানুষের অগোচরে রয়েছে।

'আরো আছে এই গাছ?'

'আছে।'

'কোথায়?'

'ওই বনে আছে।'

'কাছাকাছির মধ্যে এই একটাই?'

'আর দেখিনি বাবু।'

ব্যাপারটা যদি সত্যি হয় তা হলে বলতে হবে এখানে এসে সুদৃশ্য স্বাস্থ্যময় নিরিবিলি পরিবেশ আর টাট্‌কা সস্তা সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও একটা উপরি লাভ হয়েছে জগন্ময়বাবুর। এটার আশাই করেননি। ফিরে গিয়ে আপিসে বলার মতো গল্প হল একটা। বিষফুল! গাছের নিশ্বাসে বিষ! ওই দুটি মৃত প্রাণী না দেখলে ছেলেটির কথা তিনি আদৌ বিশ্বাস করতেন না। তবে সে এইভাবে বানিয়ে কথা বলবে কেন সেটাও একটা প্রশ্ন। এ ধরনের প্র্যাকটিক্যাল জোক একমাত্র শহরেই সম্ভব—আর তাও সে পয়লা এপ্রিলে। গাঁয়ে দেশে যে এমন জিনিস হয় না সেটা চিরকাল শহরে বাস করেও বেশ বুঝতে পারলেন জগন্ময়বাবু। আর এটাও বুঝলেন যে তাঁর বিয়াল্লিশ বছরের জীবনে আজ একটি স্মরণীয় দিন। বিষফুলের কথা আজ তিনি প্রথম শুনলেন।

অথচ মজা এই যে কাঠঝুমরিতে আসার কথাই ছিল না তাঁর। গিয়েছিলেন ডালটনগঞ্জ, তাঁর বোনের বাড়িতে দিন পনেরো ছুটি কাটিয়ে আসবেন বলে। গত বছর থেকেই একটা হাঁপের কষ্ট অনুভব করতে শুরু করেছেন জগন্ময়বাবু। ডাক্তার—শুধু ডাক্তার কেন, চেনাশোনা সকলেই—বলেছেন ড্রাই ক্লাইমেটে ক'টা দিন কাটিয়ে আসার কথা।—'বিয়ে তো করোনি; এত টাকা কার জন্য পুষে রাখছ? একটু খরচ-টরচ করো। আমাদের পেছনে না করবে তো অন্তত নিজের পিছনেই করো!'—এই 'এত টাকা'র ব্যাপারটা জগন্ময়বাবুর মোটামুটি নিস্তরঙ্গ জীবনে একটা ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ মহাসামুদ্রিক ঢেউ-এর মতো। তিনদিন রেসের মাঠে যাবার পর চতুর্থ দিনই জ্যাকপট পেয়ে যান ভদ্রলোক। এক ধাক্কায় চৌষট্টি হাজার টাকা। অথচ ঘোড়া নিয়ে কোনওদিন মাথা ঘামাননি, রেসের বই-এর পাতা খুলে দেখেননি; যাওয়া কেবল এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে। এবং কিছুটা কৌতূহলবশত। ডাক্তার নন্দী বলেন হাঁপানির টানটা ওই টাকা পাওয়ার পর থেকেই! তা হতে পারে। জগন্ময়বাবু নিজে লক্ষ করেছেন যে এই আকস্মিক ভাগ্য পরিবর্তনের ফলে তাঁর মধ্যে কিছু চারিত্রিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। যেমন, তিনি সাধারণ অবস্থায় অনেক বেশি হাতখোলা ছিলেন, এখন হিসেবি হয়ে পড়েছেন। গাড়ি কেনার সামর্থ্য হয়েছিল, কিনে-কিনেও কেনেননি। বন্ধুদের ভোজ দেবেন বলে শেষ পর্যন্ত সন্দেশের উপর সেরেছেন। আদরের ভাইপো তিলুর জন্মদিনের জন্য চুয়াল্লিশ টাকা দামের রেলগাড়িটা দর করে পয়সা বার করার সময় মত বদলে সাতাশ টাকারটা কিনেছেন। শুকনো ক্লাইমেটে দিন পনেরো কাটিয়ে আসার পরিকল্পনাটা যখন মাথায় এল, তখন বন্ধুরা অনেকেই অমুক জায়গায় অমুক হোটেল অমুক ট্যুরিস্ট লজের কথা

বলেছিল, সে সবই জগন্ময়বাবুর সামর্থ্যের মধ্যেই ছিল ; কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি খরচ বাঁচিয়ে ডালটনগঞ্জে বোনের কাছে যাওয়াই স্থির করেন। সেখানেই থাকতেন পুরো ছুটিটা। কিন্তু দুই ভাগনের এক সঙ্গে চিকেন পক্স হয়ে যাওয়ায় ভগ্নীপতি নিজেই বললেন, 'একবার কাঠঝুমরিতে মুর সাহেবের বাংলোটার খোঁজ করে দেখুন না। বিলিতি টাইপের বাংলো, খাওয়া-দাওয়া সস্তা আর ভাল, চেঞ্জও হবে, বিশ্রামও হবে। অবিশ্যি সাহেব আর নেই—মাস চারেক হল মারা গেছেন। তবে গিন্নী আছেন। এখানেই থাকেন। ওঁরা ভাড়া দেন ওদের বাংলো এটা আমি জানি।'

বুড়ি মিসেস মুর কোনও আপত্তি তোলেননি। তবু বলেছিলেন, 'এ দিকটা তো আমার স্বামীই দেখতেন। —ওঁর কয়েকজন বাঁধা খদ্দের ছিল। —তবে তাদের তো কোনও চিঠি বা টেলিগ্রাম দেখছি না ; তোমায় দিতে আপত্তি নেই, তবে পনেরো দিনের বেশি তোমাকে থাকতে দিতে পারব না, ভেরি সরি।'

'তার প্রয়োজনও হবে না।'

তিন দিন ডালটনগঞ্জে থেকে এই সবে তিনদিন হল গত শুক্রবার জগন্ময়বাবু মুর সাহেবের বাংলোতে এসে উঠেছেন। আর এসেই বুঝেছেন যে তাঁর মতো মানুষের পক্ষে ছুটি কাটানোর আর এর চেয়ে ভাল জায়গা হয় না। প্রথমত, ক্লাইমেট। এসে অবধি একদিনও নিশ্বাসের কষ্ট হয়নি। দ্বিতীয়ত, কলকাতার মানুষ জগন্ময় বারিক কল্পনাই করতে পারেননি যে ট্রাম বাস লরি ট্যাক্সি রেডিও টেলিফোন টেলিভিশন সিনেমা মানুষের কোলাহল ইত্যাদি বাদ হয়ে গেলে কী আশ্চর্য টনিকের কাজ হয়। এখন বুঝতে পারছেন যে কলকাতার মানুষ সব সময়ই কোণঠাসা ; সত্যি করে হাত পা ছড়ানো যে কাকে বলে সেটা তিনি বুঝেছেন কাঠঝুমরিতে এসে।

মুর সাহেবের বাংলো প্রথম দর্শনেই জগন্ময়বাবুর মনটা ভাল হয়ে গিয়েছিল। দূরে পিছনে পাহাড়ের লাইন, তারপর এগিয়ে এলে প্রথমে বন, বনের পর অসমতল প্রান্তর—তার এখানে ওখানে ছড়ানো ছোট বড় টিলা, আর আরও এগিয়ে এলে লম্বা লম্বা গাছ পিছনে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চিমনি আর টালির ছাতওয়ালা বিলিতি পোস্টকার্ডের ছবির মতো মুর সাহেবের বাংলো। সেই বাংলোর বারান্দা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে ঘরগুলোর ছিমছাম চেহারা, আসবাবের পারিপাট্য, জানলা ও দরজার পর্দার নকশা ইত্যাদি দেখে জগন্ময়বাবুর বিশ্বাস হল যে রেসের মাঠে জ্যাকপট পাওয়ার চেয়ে ছুটি-ভোগের জন্য এমন বাংলো পাওয়া কিছু কম ভাগ্যের কথা না।

এখানে এসেই জগন্ময়বাবু তাঁর দিনের রুটিন ঠিক করে নিয়েছিলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে হাঁটতে বেরোন, ফিরে এসে ব্রেকফাস্ট। তারপর বাংলোর বারান্দায় বা সামনের কম্পাউন্ডে বসে ম্যাগাজিন পাঠ—খান পঁচিশেক রিডারস ডাইজেস্ট নিয়ে এসেছেন তিনি বোনের বাড়ি থেকে,—তারপর স্নান-খাওয়া সেরে দিবানিদ্রা। বিকেলে চায়ের পর আবার পদব্রজে ভ্রমণ। রাত্রে সাড়ে আটটার মধ্যে খাওয়া শেষ করে ঘুম।

আজ সকালে বেড়িয়ে ফিরে এসেই চৌকিদার বনোয়ারিকে জিগ্যেস করলেন বিষফুলের কথা। অবিশ্যি প্রথমেই ফুলের কথাটা না-জিগ্যেস করে সেদিকে অগ্রসর হবার একটা রাস্তা তৈরি করে নিলেন।

'ভগওয়ান বলে কোনও ছেলেকে চেনো ?'

'হাঁ বাবু। ভিখুয়াকা লড়কা।'

'ভিখুয়া কে ?'

চৌকিদার বলল ভিখুয়া কাঠের মজুরি করে। চৌধুরীবাবুদের কাঠের গোলা আছে এই কাঠঝুমরিতেই, সেখানে কাজ করে।

'ভগওয়ানের বাড়ির দিকে রাস্তার ধারে একরকম ফুলের গাছ আছে। সে-গাছ নাকি বাতাসে বিষ ছড়ায়। —জানো?'

'হাঁ বাবু।'

'কথাটা সত্যি?'

'মর জাতা হ্যায়...সাঁপ, চুহা, বিচ্ছু-উচ্ছু...'

বনোয়ারি কফি আর ডিমের অমলেট রেখে টি-পট আনতে গেল।

'এখানে এক সাহেব এসেছিল বছর তিনেক আগে?' বনোয়ারি ফিরে এলে পর জিগ্যেস করলেন জগন্ময়বাবু। বনোয়ারি বলল সাহেব এসে থেকেছে এখানে। এককালে মূর সাহেব গিন্নীকে নিয়ে নিজেই আসতেন প্রতি শীতকালে। তিন বছর আগে কোনও সাহেব এসেছিল কি না তা বনোয়ারির মনে নেই।

জগন্ময়বাবু ঠিক করলেন বিকেলে একবার বাজারের দিকে যাবেন। বাজার পান্নাহাটে—এখান থেকে মাইল দুয়েক। রেলস্টেশনও সেখানেই। এখানে আসতে হলে স্টেশন থেকে সাইকেল রিকশা নিতে হয়। পান্নাহাট থেকে ট্রেন ধরে সোজা ডালটনগঞ্জ যাওয়া যায়। প্রথম দিন এসেই জগন্ময়বাবু একবার বাজারের দিকে গিয়েছিলেন। দুজন বাঙালির সঙ্গে আলাপ হয়েছে। পোস্টমাস্টার নুটবিহারী মজুমদার, আর পবিত্রবাবু বলে এক ভদ্রলোক, যিনি রয়েল হোটেলে উঠেছেন। মিঠে পানের খোঁজ করতে গিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ। বললেন আগেও এসেছেন কাঠঝুমরি। মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভের কাজ করেন। রয়েল হোটেল নাকি নামেই হোটেল—'বলতে পারেন থ্রি-স্টার সরাইখানা।' মনে হল বেশ রসিক লোক। বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশের বেশি না। 'আপনি উঠেছেন কোথায়? কাঠঝুমরিতে তো থাকবার জায়গাই নেই। চৌধুরী কম্পানির কারুর সঙ্গে চেনা আছে বুঝি?'

'আজ্ঞে না, আমি উঠেছি মূর সাহেবের বাংলোতে।'

'ও—ওই শিশু গাছে ঘেরা কটেজ বাড়িটা?'

জগন্ময়বাবু বললেন যে গাছে ঘেরা ঠিকই, তবে শিশু কি না বলতে পারবেন না, দেখে তো বুড়ো বলেই মনে হয়—হে হে। —'আমি মশাই সেন্ট পার্সেন্ট শহুরে। বড় জোর আম জাম কলা নারকেল আর বট-অশ্বত্থটা চিনতে পারি—তার বাইরে জিগ্যেস করলেই মুশকিল।'

এই পবিত্রবাবু আর নুটবিহারীকে আজ একবার জিগ্যেস করে দেখতে হবে। চৌকিদারের কনফারমেশন যথেষ্ট নয়। আসলে জগন্ময়বাবু কলকাতায় গিয়ে এই বিষফুলের বিষয় কিছু লিখতে চান। এখনও পর্যন্ত কেউ লেখেনি। এই একটা ব্যাপারে পায়োনিয়ার হবেন তিনি।

নুটবিহারীবাবুকে জিগ্যেস করে বিশেষ ফল হল না। বললেন, 'আমি মশাই সবে লাস্ট ইয়ারে বদলি হয়ে এখানে এসিচি। স্থানীয় সংবাদ বিশেষ আমার কাছে পাবেন না। আপনি বরং আর কাউকে জিগ্যেস করুন।'

পোস্টাপিস থেকে জগন্ময়বাবু গেলেন বাজারের দিকে। পান কেনা আছে, আর যদি একটা এক্সসারসাইজ বুক পাওয়া যায় তো কাজের কাজ হবে। লেখার জন্য তৈরি হতে হবে তো। কলম আছে সঙ্গে, খাতা আনেননি।

পবিত্রবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল একটা চায়ের দোকানের সামনে। বেঞ্চিতে বসে বাংলা খবরের কাগজ পড়ছেন। বললেন, 'আসুন, চা খান। ওহে ভরদ্বাজ—দু কাপ—একের জায়গায় দুই।'

জগন্ময়বাবু সোজা আসল প্রশ্নে চলে গেলেন।

'আপনি বিষফুলের নাম শুনেছেন ?'

পবিত্রবাবু কাগজটা ভাঁজ করে জগন্ময়বাবুর দিকে চোখ তুললেন। 'হলদে কমলা বেগনি ? তালহার যাবার পথে ডানদিকে রয়েছে তো ? একটা ঢিবির ওপরে ?'

'আপনি তো সব জানেন দেখছি !'

'বললুম তো—চারবার ঘুরে গেছি এখানে। বছর দুই থেকে দেখছি ওটা। প্রথম যেদিন দেখি সেদিন ঢিবির পাশে একটা আস্ত শুয়োরছানা মরে পড়েছিল।'

'বলেন কী ! তা এই নিয়ে আপনি কাউকে বলেননি কিছু ? আপনি তো কলকাতার লোক—কাগজে-টাগজে— ?'

পবিত্রবাবু উড়িয়ে দিলেন। 'বলবার কী আছে মশাই ? প্রকৃতির খামখেয়াল কত রকম হয় সব নিয়ে কি আর কাগজে লেখে ? আরো কত হাজার রকম বিষফুল বিষফল বিষপোকা বিষপাখি রয়েছে পৃথিবীতে কে জানে। আরে মশাই, কলকাতাতে বাস, সেখানে হাওয়াটাই বিষাক্ত। প্রতি নিশ্বাসে পাঁচ সেকেন্ড করে আয়ু কমে যাচ্ছে—সেদিন দেখলুম কোথায় জানি লিখেছে। সেখানে ফুলের বিষ নিয়ে কে মাথা ঘামাতে যাচ্ছে মশাই ?'

'কিন্তু এখানকার লোক...এদের পক্ষে তো এটা একটা ডেঞ্জার মশাই ?'

'কাছে না ঘেঁষলেই হল। পাঁচ সাত হাত দূরে থাকলেই তো সেফ। সেকথা এখানে সবাই জানে।'...

জগন্ময়বাবু চা খেয়েই উঠে পড়লেন। অক্টোবরের মাঝামাঝি ; সূয্যি ডুবলেই ঝপ্ করে ঠাণ্ডা পড়ে। সর্দিগর্মির রিস্কটা না নেওয়াই ভাল।

চায়ের দোকানের পাশেই একটা মনিহারি দোকান থেকে খাতা কিনে ভদ্রলোক যখন বাড়ি ফিরলেন তখন সোয়া ছটা। মনে বেশ একটা উত্তেজনা অনুভব করছেন তিনি। পাকা কনফারমেশন পাওয়া গেছে, এবার উনি স্বচ্ছন্দে লিখতে পারেন। লেখাটা কোনও উদ্ভিদবিজ্ঞানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে একটা বড় কাজ হবে। কাঠঝুমরির নামটাও লোকের জানা উচিত। ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্ট জানে কি নামটা ? মনে তো হয় না।

লেখার অভ্যেস নেই তাই খাতা খুলে হাতের কলমটার উপর থুতনিটা ভর করে আধঘণ্টা বসে থেকেও কোনও ফল হল না। এত চট্ করে হবে না। হাতে আরও দশ দিন সময় আছে। ধীরে সুস্থে ভেবেচিন্তে লিখতে হবে। বিষফুল...। নামটা দুবার আপন মনে উচ্চারণ করলেন জগন্ময়বাবু। বিষফুল... ! এই নামের লেখা লোকে না পড়ে পারবে না।

॥ ২ ॥

আজ আর বাইনোকুলারের দরকার হল না। সকাল সাতটার সময় ঢিবিটার কাছে পৌঁছে রাস্তা থেকে খালি চোখেই জগন্ময়বাবু যে মৃত প্রাণীটা দেখতে পেলেন সেটা হল একটা খরগোশ। মরা সাপের কঙ্কাল আর মরা গিরিগিটিও এখনও রয়েছে। মৃতের সংখ্যা

আরো বাড়লে হয়তো জায়গাটা পরিষ্কার করবে এসে ভগওয়ান বা ভগওয়ানের বাপ।

জগন্ময়বাবু হিসেব করতে চেষ্টা করলেন গাছটা কত দূর হবে রাস্তা থেকে। বিশ হাত ? পঁচিশ হাত ? তাঁর একটা অদম্য ইচ্ছে একটু এগিয়ে গিয়ে গাছটাকে আরেকটু ভাল করে দেখার। পাঁচ হাতের বেশি কাছে না গেলেই তো হল।

কিন্তু ওই ছোকরার অনুমান যদি ভুল হয় ?

যদি সাত হাত, আট হাত দূর পর্যন্ত ফুলের প্রভাব পৌঁছায়।

জগন্ময়বাবু ঘাসের উপর দিয়ে তিন পা এগিয়ে আবার পেছিয়ে এলেন। সাপ, খরগোশ, গিরগিটি। শুয়োর। পোকামাকড়ের কথা ছেলেটি বলেনি। ফড়িং পিঁপড়ে মশামাছি—এ সবই কি এই গাছের বিষে মরে ? না ছোট জিনিস রেহাই পায় ? আর বড় জিনিস ? তাঁর লেখার জন্য এগুলো জানা দরকার। আজ ছেলেটিকে দেখছেন না। একবার তার বাড়ি যাবেন নাকি ? একটা ইন্টারভিউ করবেন তাকে—যেমন অনেককে খবরের কাগজে করে ?

প্রশ্নটা মাথায় আসতেই মনে হল—তাড়া নেই, সব হবে। ধীরে সুস্থে, ধীরে সুস্থে। হাতে আরো সাতদিন সময়।

এখানে জলটা ভাল, তাই খিদে হয় প্রচুর। ব্রেকফাস্টের কথা চিন্তা করতে করতে জগন্ময়বাবু বাড়ি ফিরলেন। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা বিশাল কম্পাউন্ড। দুটো কাঠের গেট, একটা পশ্চিমে, একটা উত্তরে।

উত্তরের গেটে—যেটা দিয়ে জগন্ময়বাবু এখন ঢুকলেন—এখনও একটা কাঠের ফলকে মূর সাহেবের নাম রয়েছে। গেট থেকে সোজা রাস্তা দিয়ে কটেজের সামনের বারান্দায় শেষ হয়েছে। বড় বড় গাছগুলো, যেগুলোকে পবিত্রবাবু শিশু বললেন, সেগুলো কটেজের পিছনদিকে। এদিকে দক্ষিণে যে দুটো বড় গাছ রয়েছে সেগুলো শিশু নয় নিশ্চয়ই, কিন্তু সেগুলোর নামও জগন্ময়বাবু জানেন না। এর মধ্যে যেটা দূরের গাছ, সেটার ডালপালাগুলো প্রায় সাদা আর বেশ ছড়ানো। গুঁড়িটা কালো হলে হয়তো আরো সহজে চোখে পড়ত, কিন্তু সাদা হওয়া সত্ত্বেও, খুব বেশি দূরে নয় বলে গুঁড়ির পাশের চেনা গাছটা জগন্ময়বাবুর দৃষ্টি এড়াল না।

সেই একই গাছ, একই বিচিত্র ফুল।

বিষফুল !

জগন্ময়বাবুর পেট থেকে খিদেটা ম্যাজিকের মতো উবে গেল।

এ গাছ কাল ওখানে ছিল না। জগন্ময়বাবু ওই সাদা গুঁড়িটা থেকে হাত দশেক দূরে বনোয়ারিকে দিয়ে ডেক চেয়ারটা আনিয়ে তাতে বসে রোদ পোহাচ্ছিলেন। তখন তাঁর কোনও কাজ ছিল না, কেবল শরৎকালের মিঠে রোদটা উপভোগ করা। তাঁর চোখ তখন চতুর্দিকে ঘুরছে, এমন কী সাদা গুঁড়িটার দিকেও। এটা মনে আছে, কারণ জগন্ময়বাবুর তখন মনে হয়েছিল গুঁড়িটার রঙের সঙ্গে ইউক্যালিপটাসের গায়ের রঙের মিল আছে। ওই আরেকটা গাছ ওঁর চেনা। ইউক্যালিপ—

ওটা কী ?

একটা পাখি।

খয়েরি রং—মাথা থেকে ল্যাজের ডগা অবধি। শালিকের চেয়ে ছোট। পাখিটা মাটিতে খুঁটে খুঁটে কী জানি খাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে খাওয়া থামিয়ে মাথা তুলে চিড়িক চিড়িক ডাকছে। ওই ফুলগাছটার হাত দশেকের মধ্যে। এবার দুটো ছোট্ট লাফ মেরে

পাখিটা ফুলগাছটার দিকে আরো এগিয়ে গেল। জগন্ময়বাবু আর অপেক্ষা না করে সজোরে দুটো তালি মারলেন। পাখিটা তীক্ষ্ণ শিস দিতে দিতে উড়ে পালিয়ে গেল। জগন্ময়বাবু হাঁফ ছাড়লেন। কিন্তু গাছটা তো রয়ে গেল।

ওটার একটা ব্যবস্থা করা যায় না ? সামনে রাস্তায় অনেক ঢেলা পড়ে আছে।

একটা ঢেলা হাতে তুলে নিয়ে জগন্ময়বাবু গাছটাকে তাক করে নিক্ষেপ করলেন। গাছটা থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। লেগেছে ! কিন্তু কোনও ফল হবে কি একটা ঢিলে ?

জগন্ময়বাবু অনুভব করলেন যে তাঁর মাথায় খুন চেপেছে। পর পর ত্রিশটা ঢেলা মারলেন গাছটার দিকে। কোনওদিন ক্রিকেট খেলেননি, তাই বোধহয় অর্ধেক ঢেলা পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল ; কিন্তু বাকিগুলো লাগল। গাছটা নুয়ে পড়েছে।

'উয়ো ফির খাড়া হো যায়গা বাবু।'

ভগওয়ান। গেটের বাইরে বই হাতে দাঁড়িয়ে দেখছে, মুখে মৃদু হাসি !

'হোক্ গে খাড়া', বললেন জগন্ময়বাবু। 'কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত।'

ভগওয়ান চলে গেল।

ঘটনাটা যে চৌকিদার আর মালিও দেখেছে সেটা বাংলোর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বুঝলেন জগন্ময়বাবু। বোঝাই যাচ্ছে দুটোই অকর্মার ঢেঁকি। তাঁকে একটু হেল্‌প করতে পারল না এগিয়ে এসে ?

ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে মনে হল যে চৌকিদার আর মালির এই যে নিস্পৃহ ভাব, তার জন্য হয়তো উনি নিজেই কিছুটা দায়ী। এখানে এসেই বোধহয় ওদের দুজনের হাতে কিছু আগাম বকশিশ গুঁজে দেওয়া উচিত ছিল। মালি তো স্টেশনে গিয়েছিল ওকে আনতে। মিসেস মূর টেলিগ্রামে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কুলির বদলে উনি মালির পিঠেই মাল চাপিয়েছিলেন। একটা সুটকেস, একটা বেডিং, একটা বড় কল-লাগানো ফ্লাস্ক। নিজের হাতে নিয়েছিলেন কেবল ছাতা আর বোনের দেওয়া এক হাঁড়ি মিষ্টি। বাংলোয় পৌঁছে উনি মালির জন্য দুটো টাকা বার করেও আবার পকেটে রেখে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন—'যাবার দিন পুষিয়ে দেব ; আগে দেখি না ব্যাটারা কীরকম কাজ করে।'

কাজ অবিশ্যি ভালই করেছে দুজনে। কিন্তু কাজের বাইরে আগ বাড়িয়ে এসে দুটো কথা বলা, কী চাই না-চাই, কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না, এসব জিগ্যেস করা—এটা দুজনের একজনও করেনি। কাঠঝুমরির এই একটি ব্যাপারই জগন্ময়বাবুর কাছে 'লেস দ্যান পারফেক্ট' বলে মনে হয়েছিল। এখন বুঝছেন দোষটা খানিকটা ওঁর নিজেরই।

'এই বাড়ির আশেপাশে ওই গাছ আরো আছে নাকি ?'—চায়ে চিনি নাড়তে নাড়তে চৌকিদারকে জিগ্যেস করলেন জগন্ময়বাবু। চৌকিদার বলল বাংলোর চৌহদ্দির মধ্যে ওই গাছ ও আজ এই প্রথম দেখল।

'একি রাতারাতি গজিয়ে যায় নাকি ?'

'ওইসাই তো মালুম হোতা বাবু।'

'একটু খেয়াল রেখো তো। দেখলে আমায় বলবে।'

বনোয়ারি বলার আগেই জগন্ময়বাবুর চোখে পড়ল। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে বারান্দার বেরিয়ে এসেই।

বারান্দার পুব কোনার পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে এক গোছা চেনা ফুল। ঝিরঝিরে বাতাসে দুলছে ফুলগুলো। হাত পনেরোর বেশি দূরে নয়।

জগন্ময়বাবু বুঝতে পারলেন তাঁর পা দুটো কেমন যেন অবশ হয়ে আসছে। কোনও

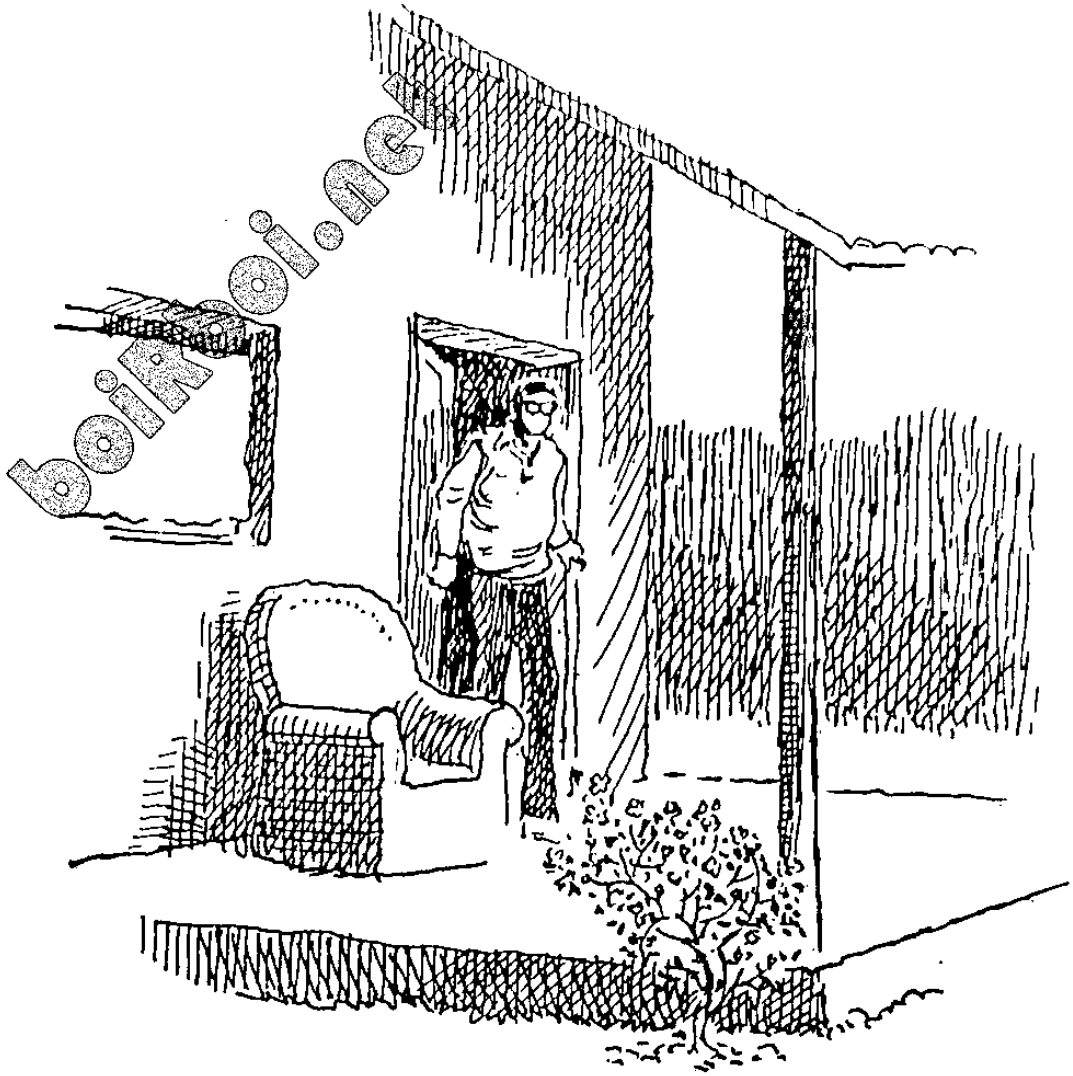

মতে এক পা পাশে সরে গিয়ে ধপ্ করে বসে পড়লেন বেতের চেয়ারের উপর। একবার মালি বলে ডাকতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। গলা শুকিয়ে গেছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। হাত-পা ঠাণ্ডা।

হাওয়াটা পুব দিক থেকেই আসছে। গাছের দিকে থেকেই। তার মানে ওই ফুলের বিষাক্ত প্রশ্বাস—

জগন্ময়বাবু আর ভাবতে পারলেন না। এখানে বসা চলবে না। এর মধ্যেই তিনি অনুভব করছেন তাঁর নিশ্বাসের কষ্ট।

শরীর ও মনের অবশিষ্ট সব বলটুকু প্রয়োগ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে টলতে টলতে বৈঠকখানা পেরিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে শয্যা নিলেন জগন্ময়বাবু।

চৌকিদার রাত্রে কী রান্না হবে জিগ্যেস করতে এলে পর বললেন, 'কিচ্ছু না—খিদে নেই।'

তা সত্ত্বেও বনোয়ারি নিজ থেকেই এক গেলাস গরম দুধ নিয়ে এল বাবুকে খাওয়ানোর জন্য। অনেক অনুরোধের পর জগন্ময়বাবু কোনও রকমে অর্ধেকটা খেয়ে বাকিটা ফেরত দিয়ে দিলেন।

দূরে মাদল বাজছে। বাজারে শুনেছিলেন কোথায় জানি মেলা বসবে। সাঁওতালের নাচ হবে সেখানে। ক'টা বাজল কে জানে। কম্বলের তলায় শুয়ে জগন্ময়বাবু অনুভব করলেন যে তাঁর এখনও শীত লাগছে। আলনা থেকে আলোয়ানটা নিয়ে কম্বলের উপর

চাপিয়ে দিতে খানিকটা কাজ হল। তার ফলেই বোধহয় একটা সময় জগন্ময়বাবু বুঝলেন তাঁর চোখের পাতা দুটো এক হয়ে আসছে।

এর আগের ক'দিন এক ঘুমে রাত কাবার হয়েছে। আজ হল না। চোখ খুলতে ঘরে আলো দেখে প্রথমে খট্‌কা লেগেছিল, তারপর মনে পড়ল নিজেই বনোয়ারিকে বলেছিলেন আজ ঘরে লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে রাখতে। এখনও শীত। হাওয়াটা ওই বাইরের দিকের জানালাটা দিয়েই আসছে বোধহয়। কিন্তু ওটা তো বন্ধ করেছিলেন উনি শোবার আগে। কেউ খুলল নাকি ?

জগন্ময়বাবু ঘাড় তুললেন দেখবার জন্য।

জানালার পাশেই ড্রেসিং টেবিল। তার উপরেই রাখা লণ্ঠনের আলো পড়েছে তার পাল্লায়।

শুধু পাল্লায় না ; বাইরে থেকে যে জিনিসটা উঁকি মারছে, তার উপরেও। সেই আলোতেই চেনা যাচ্ছে জিনিসটাকে।

এ সেই একই গাছ। একই গাছ, একই ফুল। হল্‌দে বেগুনি কমলা।

বিষফুল !

জগন্ময়বাবু বুঝতে পারলেন, তাঁর তলপেট থেকে যে আর্তনাদটা কণ্ঠনালী বেয়ে উপরের দিকে উঠে আসছে, সেটা মুখ দিয়ে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সংজ্ঞা হারাবেন।

আর হলও তাই।

কামরাটা খালি পেয়ে জগন্ময় বারিক একটু নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। কারণ লোকের সান্নিধ্য এখন তাঁর ভাল লাগছে না। কাঠঝুমরিতে এমন স্বপ্নের মতো সুন্দর প্রথম তিনটি দিন গত দু-দিনে কী করে এমন বিভীষিকায় পরিণত হতে পারে, সেই নিয়ে তিনি এই সাত ঘণ্টার জার্নির মধ্যে একটু চুপচাপ একা বসে ভাবতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গার্ডের হুইসেলের সঙ্গে সঙ্গে একটি চেনা লোক তাঁর কামরায় এসে উঠলেন। পান্নাহাটের পোস্টমাস্টার নুটবিহারী মজুমদার। ভদ্রলোকের সঙ্গে সেদিনের পর আর দেখা হয়নি।

'সে কী মশাই ! এর মধ্যেই ফিরে চললেন নাকি ? নাকি আপনিও বেতোল যাচ্ছেন ?'

'বেতোল ?'

'এর পরের স্টেশন। মেলা বসেছে সেখানে। গিন্নীর হুকুমে সওদা করতে যাচ্ছি।'

'ও।'

'আপনি কোথায় চললেন ?'

'ডালটনগঞ্জ।'

'শরীর খারাপ হল নাকি ? এই দু'দিনেই এত পুল্‌ড ডাউন... ?'

'হাঁ...একটু ইয়ে...'

নুটবিহারীবাবু মাথা নেড়ে একটু ফিক্ করে হেসে বললেন, 'যাক, ভদ্রলোকের লাক্‌টা ভাল।'

'লাক ?'

'পবিত্রবাবুর কথা বলছি।'

'কেন ?'

'আরে, উনি তো আজ দশ বছর হল বছরে দুবার করে মুর সাহেবের বাংলোতে এসে

থাকেন। ওটা এক রকম ওঁর মনোপলি। অক্টোবর আর মার্চ। লিখতে আসেন। বড় রাইটার তো। পবিত্র ভট্টাচার্য—নাম শোনেন নি ? লেখেন, আর ভগবান বলে একটা কাঠুরের ছেলেকে বাংলা শেখান। শখের মাস্টারি ! একটু আদর্শবাদী প্যাটার্নের লোক আর কী। আপনি গেচেন শুনে নেচে উঠবেন। ভারী আক্ষেপ করছিলেন নিজের ডেরা ছেড়ে হোটেলে থাকতে হচ্ছে বলে। বললেন বুড়ো মূর বেঁচে থাকলে এ গোলমাল হত না, বুড়িই গণ্ডগোলটা করেছে।'

বেতোল স্টেশনে নুটবিহারী নেমে যাবার পর গাড়িটা ছাড়বার ঠিক মুখে জগন্ময়বাবু দেখলেন প্ল্যাটফর্মের ধারে লোহার রেলিং-এর পিছনে ফুলের ঝাড়টা। একটা-আধটা নয়, এক মাঠ জুড়ে কমপক্ষে একশোটা।

আর তারই মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে খেলা করছে তিনটি ছাগলছানা !